ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যাহ্নকাল—নীতি ও সাংগঠনিক ভিত্তি

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ঃ

উনবিংশ শতাব্দী ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে ভিক্টোরীয় যুগ নামে পরিচিত। এই যুগের প্রধান দুটি বিষয় ছিল—উদার নৈতিকতাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ। উদারনৈতিক মতাদর্শ ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের দিক নির্দেশ করেছিল। এর ফলে ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও জাতীয় একাত্মতার মধ্যে যোগসূত্র রচিত হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের জাতীয় চেতনায় মুক্তপন্থী মতাদর্শের প্রভাব প্রসঙ্গে Elie Halevy "The Age of Peel and Cobden" গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন "British liberalism, that is to say, was regarded by the English themselves as intimately bound up with the solidity of their institutions. Was liberalism a result of solidity or the solidity of its institutions?" ভিক্টোরীয় যুগের মধ্যবর্তী পর্বে প্রগাঢ় নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু শতাব্দীর শেষপর্বে এই নৈতিক মূল্যবোধ অনেকটা শিথিল হয়ে পড়ে এবং জাতিবৈরিতা ও উগ্র আত্মবিশ্বাস জাতীয় চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছিল। বিশ্বের প্রধানতম সামুদ্রিক ও বাণিজ্যিক শক্তিরূপে ব্রিটেন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে। এইসময়ে ব্রিটিশ অর্থনীতি অগ্রগতির চরমে পৌঁছয়। ১৮৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শিল্পজাত পণ্য বিশ্ব বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশ দখল করতে সক্ষম হয়। শিল্প ও বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের পাশাপাশি ব্রিটেন বিশ্বের প্রধানতম ঔপনিবেশিক শক্তিতে পরিণত হয়। নিম্নলিখিত সারণিতে বিভিন্ন শক্তিবর্গের ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের তুলনামূলক অবস্থান পরিবেশিত হল—

ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণ (১৮৭৬-১৯১৪)

	সাল ১৮৭৬		সাল ১৯১৪	
	আয়তন (মিলিয়ন কি.মি.)	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	আয়তন (মিলিয়ন কি.মি.)	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)
ব্রিটেন	২২.৫	২৫১.৯	৩৩.৫	৩৯৩.৫
রাশিয়া	১৭.০	১৫.৯	১৭.৪	৩৩.২
ফ্রান্স	০.৯	৬.০	১০.৬	৫৫.৫
জার্মানি	—	—	২.৯	১২.৩
যুক্তরাষ্ট্র	—	—	০.৩	৯.৭

Scanned with CamScanner

	সাল ১৮৭৬		সাল ১৯১৪	
	আয়তন (মিলিয়ন কি.মি.)	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)	আয়তন (মিলিয়ন কি.মি.)	জনসংখ্যা (মিলিয়ন)
জাপান	—	—	০.৩	১৯.২
মোট	৪০.৪	২৭৩.৮	৬৫.০	৫২৩.৪
ক্ষুদ্র দেশ হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম প্রভৃতি	—	—	৯.৯	৪৫.৩

উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় উনিশ শতকের শেষ তিন দশকে ইউরোপ ও বিশ্বের অন্যান্য উদীয়মান শিল্পোন্নত দেশগুলি সকলেই ঔপনিবেশিক বিস্তারের পথে ধাবিত হয়েছিল। তবে ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণে ইংল্যাণ্ড অন্যান্য দেশের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হলেও ইংল্যাণ্ডের প্রাধান্য অটুট ছিল। শুধুমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের গতি নির্দ্ধারিত হয়নি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল জাত্যাভিমান, আধিপত্যবাদী মানসিকতা, পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক বিচ্ছুরণের উদগ্র বাসনা। ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কাঠামোর প্রধানতম ভিত্তি এবং এশিয়ার ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক তৎপরতার স্নায়ুকেন্দ্র।

(ক) সাংবিধানিক পরিবর্তন ঃ

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসে এক নবপর্যায় শুরু হয়। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইন অনুসারে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতীয় সাম্রাজ্য সরাসরিভাবে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা ও সংসদের নিয়ন্ত্রণে এল। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন ও অন্যান্য ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের আগমনকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দায়িত্বহীন শাসনের পরিণতি বলে চিহ্নিত করেন। তাই ভারতের মত বিশাল দেশের শাসনভার কোম্পানীর মত একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ওপর না রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ভারত শাসন আইন অনুসারে ভারতের শাসনভার ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে প্রবিষ্ট হল।

কিন্তু ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সাংবিধানিক পরিবর্তন কোনও আকস্মিক বা বৈপ্লবিক ছিল না। বিগত শতকে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে যে রকম ঘটনা প্রবাহের অনিবার্য পরিণতি রূপে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতে রাজশক্তিরূপে অবতীর্ণ হয়েছিল, অনুরূপভাবে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতে ক্ষমতা অধিগ্রহণকে ক্যানিংহাম বাস্তব পরিবর্তন অপেক্ষা আনুষ্ঠানিক পরিবর্তন "(a formal change)" বলে অভিহিত করেছেন। ক্যানিংহামের মত

Scanned with CamScanner

নিঃসন্দেহে সমর্থনযোগ্য। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দের পিটের ভারত শাসন আইন রচিত হওয়ার সময় থেকেই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ভারতে কোম্পানীর শাসনের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে এবং কোম্পানীর পরিচালক সভার দায়িত্ব বিশেষভাবে সংকুচিত হয়। এরপর ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দের সনদ অনুসারে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যিক অধিকার বিলুপ্ত হয়। ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের সনদে কোম্পানীর শাসন বহাল রাখার কোনও সময়সীমা নির্দ্ধারিত হয়নি। শেষ পর্যন্ত মহাবিদ্রোহের সূত্র ধরে কোম্পানীর ক্ষীয়মান ক্ষমতার অবলুপ্তি ঘটে। অধ্যাপক পার্সিভ্যাল স্পিয়ার যথার্থই মন্তব্য করেছেন "ভারতে কোম্পানীর শাসনের খোলসটি বহাল থাকলেও তাতে শাঁসটুকু অবশিষ্ট ছিল না ("The company had already become a husk of its former self.")

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ভারত সরকার আইন ঃ ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ২রা আগস্ট ইংল্যাণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার অনুমোদন লাভ করার পর এই আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইন দ্বারা ভারতের শাসন-সংক্রান্ত বিষয়ে ইংল্যাণ্ডে বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি ও কোম্পানীর ডাইরেক্টর-সভার সকল কর্তৃত্বের অবসান ঘটে এবং ভারত-সচিব (Secretary of State for India) নামে এক ব্রিটিশ মন্ত্রীর ভারত-সংক্রান্ত সর্বোচ্চ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। ভারত-সচিব ইংল্যাণ্ডের রানীর (অথবা রাজার) নামে ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভারত সম্পর্কে ইংরেজ রাজনীতিকদের বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকায় এবং ভারত-সচিবের সর্বাত্মক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিল' নামে একটি পরিষদ গঠন করা হয়। এই কাউন্সিলের প্রধান দায়িত্ব হল ভারতের শাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারত-সচিবকে পরামর্শ দেওয়া। কাউন্সিলের সদস্যদের কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়, যথা—ভারতের রাজস্ব-ব্যয় এবং বড়লাটের পরিষদের (Viceroy's Council) সাধারণ সদস্য নিয়োগ করার ক্ষেত্রে ভারত-কাউন্সিলের অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা হয়। অবশ্য প্রয়োজনবোধে ভারত-সচিবকে তাঁর ক্ষমতাপ্রয়োগের অধিকার দেওয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভারত-সচিব ভারত-কাউন্সিলকে অগ্রাহ্য করার মত ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। পরবর্তীকালে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের আইনের দ্বারা (Act of 1869) ভারত-সচিবের এই ক্ষমতা বিধিবদ্ধ রূপ পেল এবং ভারত-কাউন্সিলের অধিকাংশ ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয়।

ব্রিটিশ সরকারের অন্যান্য মন্ত্রীর ন্যায় ভারত-সচিব ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়বদ্ধ ছিলেন। কিন্তু ভারত সম্পর্কে ব্রিটিশ রাজনীতিকদের জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছিল নিতান্তই সামান্য। ফলে ভারত-সচিবের ওপর পার্লামেন্টের কর্তৃত্বও ছিল নিতান্তই সামান্য। এককথায় ভারত সরকারের ওপর ভারত-সচিবের কর্তৃত্ব ছিল অবাধ ও নিরঙ্কুশ।

Scanned with CamScanner

ভারতের বড়লাটের নিকট গোপন নির্দেশ ও বার্তা প্রেরণ করার একমাত্র ক্ষমতা ভারত-সচিবকে দেওয়া হল। প্রতি বৎসর ভারত সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উপস্থাপিত করার ভার ভারত-সচিবের ওপর ন্যস্ত করা হল।

১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ভারত সরকার আইনের মাধ্যমে ভারতীয় সাম্রাজ্যের ওপর বাহ্যত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব স্থাপিত হলেও কার্যক্ষেত্রে ভারতের শাসন ব্যবস্থা সম্পর্কে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট তেমন আগ্রহী ছিল না। প্রকৃতপক্ষে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কাঠামো ভারত-সচিব, ভারতের বড়লাট ও প্রাদেশিক গভর্নরদের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। ভারতের প্রভাবশালী ব্রিটিশ কর্মচারীগণ অবাধ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলিও ভারত-শাসন সম্পর্কিত নীতি নির্দ্ধারণে উৎসাহিত ছিলেন না। সুতরাং দেখা যায়, ভারতে কোম্পানীর শাসনের আনুষ্ঠানিক অবসান ঘটলেও ভারতে ব্রিটিশ শাসনের চরিত্রে গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি। ক্ষমতা হস্তান্তর একটি মামুলি পদক্ষেপ ছিল।

কিন্তু ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের পর ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নীতি সম্পর্কে দু'ধরনের পরস্পরবিরোধী মতামত প্রচলিত আছে। প্রথমত, একথা বলা হয়ে থাকে যে ব্রিটিশ শাসকবর্গ ভারত সম্পর্কে উদাসীন ও রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন এবং শাসন ও শোষণের দিকেই নজর দিয়েছিলেন। কিন্তু পার্সিভ্যাল স্পিয়ার, এ্যারিক স্টোকস প্রমুখের বক্তব্য হল ব্রিটিশ শাসনের চরিত্রে কোনও সার্বিক ও নেতিবাচক পরিবর্তন ঘটেনি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের সংস্কারবাদী কার্যকলাপ ছেদ পড়েনি এবং আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। ডঃ স্পিয়ারের মতে "The Government as a whole was looking forward to a modernised India." কিন্তু স্টোকস ও স্পিয়ার আধুনিকীকরণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিলেও ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের ১লা নভেম্বর মহারানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে (Queen's proclamation) পরিবর্তনের স্বপক্ষে কোনও নীতি ঘোষণা করা হয়নি, শুধুমাত্র স্থিতাবস্থা রক্ষার অঙ্গিকার ব্যক্ত করা হয়েছিল। এই ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল যে একমাত্র ব্রিটিশ নাগরিক ও প্রজাদের হত্যাকাণ্ডের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত দোষী ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে অন্যদের ওপর কোনও শাস্তিমূলক নীতি গৃহীত হবে না এবং জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ভারতবাসী উচ্চ রাজকার্যে নিযুক্ত হওয়ার সুযোগ পাবে।

(খ) সামরিক সংগঠন ঃ

মহাবিদ্রোহের পর ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অগ্রাধিকার পেয়েছিল—এগুলি হল সামরিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন। সামরিক দিক থেকে দুটি বিষয় ব্রিটিশ সরকারের অস্বস্তির কারণ হয়ে উঠেছিল। এর একটি হল ভারতীয় সেনার তুলনায় শ্বেতাঙ্গ সেনার আনুপাতিক সংখ্যাল্পতা। এছাড়া ভারতীয় সেনাদের যুথবদ্ধ চরিত্র। ভারত সচিব চার্লস উড ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভেদ

ও বিচ্ছিন্নতাবোধ সঞ্চার করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। মহাবিদ্রোহের পরবর্তীকালে সামরিক সংস্কারের ক্ষেত্রে এই দুটি বিষয় বিবেচিত হয়। প্রথমত, ভারতীয় সেনার সংখ্যা বিশেষভাবে সংকুচিত করা হল। ১৮৫৭ সালে ভারতীয় সেনার সংখ্যা ছিল ২৩৮০০০, ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে তার অর্ধেক হ্রাস পায়, অন্যদিকে ইউরোপীয় সেনার সংখ্যা ৪৫০০০ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াল ৬৫০০০। সৈন্যবাহিনীর তিনটি প্রেসিডেন্সী পরস্পরের কাছ থেকে পৃথক রাখা হল। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও ছত্রীদের সংখ্যা সঙ্কুচিত করা হল। মহাবিদ্রোহে বেঙ্গল আর্মি বিশেষ অংশ নেয়, তাই এই বাহিনীকে কার্যত ভেঙে ফেলা হল। বাঙালী ও অন্যান্য জাতিদের অসামরিক সম্প্রদায় ঘোষণা করে সেনাবাহিনী থেকে বিযুক্ত করা হল। অন্যদিকে গুর্খা ও শিখ প্রমুখ অনুগত সামরিক জাতিগুলিকে সেনাবাহিনীর মধ্যে বেশিমাত্রায় নিযুক্ত করা হল। ভারতীয় সেনাবাহিনী গঠনে সাম্প্রদায়িক ও জাতিভিত্তিক বিভেদ জিইয়ে রাখা হল। মিশ্র সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে রেজিমেন্টগুলি গঠন করা হল। এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে ভারতীয় সেনারা ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সংশ্লিষ্ট না হতে পারে। ভারত সচিব মন্তব্য করেছিলেন "If one regiment mutinies I should like to have the next regiment so alien that it would be ready to fire into it." সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার উদ্দেশ্যে উচ্চপদগুলিতে ভারতীয়দের নিয়োগ নিষিদ্ধ হল এবং গোলন্দাজ, কামান বাহিনীর পরিচালনার দায়িত্ব ইউরোপীয়দের নিয়ন্ত্রণে রাখা হল।

(গ) অর্থনৈতিক সংগঠন ঃ

১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দের মহাবিদ্রোহের ঝড় সরকারি অর্থব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছিল। মহাবিদ্রোহ দমন করতে ভারত সরকারের ঋণের পরিমাণ ছিল ৪০ মিলিয়ন স্টার্লিং। সরকারের শোচনীয় আর্থিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীল করে তোলার জন্য লন্ডনের The Economist পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞ জেমস উইলসন বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদের অর্থবিভাগীয় সদস্যরূপে নিযুক্ত হলেন। ক্যানিং অর্থসংকট দূর করার জন্য উইলসনের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। তিনি ব্যয় সংকোচ ও আর্থিক সহায় সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কয়েকটি সুপারিশ করেন। যদিও ভূমিরাজস্ব সরকারের আয়ের প্রধান উৎস ছিল, কিন্তু ১৮৬০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে উইলসন আর্থিক পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য আয়কর আরোপের প্রস্তাব দেন। এই প্রস্তাব অনুসারে বার্ষিক ৫০০ টাকার অতিরিক্ত আয়ের ওপর শতকরা চার ভাগ ও ২০০ থেকে ৫০০ টাকা আয়ের ওপর দুই শতাংশ আয়কর ধার্য করা হল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য দুই শতাংশ আয়করের প্রস্তাব তুলে নেওয়া হয় এবং ৪ শতাংশ আয়কর তিন শতাংশে হ্রাস করা হয়। অবশ্য আয়কর নিয়ে বিত্তবান ভারতবাসী ও ভারতে বসবাসকারী ইংরেজগণ আয়করের বিরুদ্ধে দাবি ব্যক্ত করেন। শেষ পর্যন্ত

Scanned with CamScanner